বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতীকী ভাস্কর্য 'অপরাজেয় বাংলা'। যার হাত দিয়ে তৈরি হয়েছে বাঙালি জাতির অর্জনের স্বারক তার নাম সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে, বাঁধা-বিপত্তি পেরিয়ে তৈরি করেছেন অপরাজেয় বাংলা। শিল্পী আবদুল্লাহ খালিদ বর্তমানে শিক্ষকতা করছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অপরাজেয় বাংলার ২৫ বছর পূর্তি হলো...

শিল্পীর সঙ্গে কথা বলেছেন **গোলাম মোর্তোজা**

অপরাজেয় বাংলা'র স্রষ্টা সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ

সাপ্তাহিক ২০০০ : ১৯৭১ বাঙালি জাতির জীবনে নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। আপনারা যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় ও পরবর্তীতে নানা রকম কাজ করেছেন যার যার অবস্থানে থেকে। আপনার জীবনে মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে ছিল, কিভাবে আছে বা কিভাবে থাকবে- বাঙালি জাতির ঐতিহ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এ বিষয়গুলো নিয়ে আপনার বিশ্লেষণ কী?

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : ১৯৬৬ সালে চারুকলা দ্বিতীয় বর্ষে পা দেয়ার সময় থেকেই আমি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তখন আমি সাধারণ সম্পাদক। আর ১৯৬৮-৬৯ সালে ভিপি ছিলাম। '৬৯-এর আন্দোলনে সাংঘাতিকভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলাম।

১৯৬৯-এ আবুল হাসানাত, মফিদুল হক, আসাদুজ্জামান নূর এদের সঙ্গে আমরা কাজ করতাম। ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। কার্ফ্যু দেয়া হলো। আমরা ছাত্ররা তা ব্রেক করলাম। ঐ সময় প্যানেল করার প্রথম প্রয়াস পাই বাঙালি জাতিসত্তার ওপর। বাঁশপাতার কাহিনী বলে একটি বড় ব্যানার করা হয়। ঐ ব্যানার অসাধারণ সুন্দর ছিল। অনেকগুলো অংশে এটা বিভক্ত ছিল। মা ও শিশু এবং শিল্পী মস্তফা মনোয়ার তার হারিকেনের আলোয় পড়ছে। আকাশে চাঁদ। অ, আ; ক, খ পড়ছে। তারপর দেখা যায় ছেলেটা বড় হয়েছে। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে লেখে। আরো একটু বড় হয়ে ছেলেটা স্কুলে যায়। আর অবসর সময়ে সে রাখালদের সঙ্গে গরু চরায় বা রাখালের বাঁশি শোনে। তারপর এক সময় ছেলেটা ম্যাট্রিক পাস করলো। বাবা ভাবলো তার সন্তান বড় হয়েছে। শহরে পাঠাবে লেখাপড়া করতে। সেই ছেলে শহরে এসে যখন দেখলো সে যে ভাষায় কথা বলে, লিখতে শিখেছে, সে ভাষায় কথা বলা যাবে না। তখন সে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। এক সময় পুলিশের বাঁশের লাঠির আঘাতে সে মারা যায়। এই কাহিনীচিত্রগুলো সে সময় অসাধারণ ছিল। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে মূলত চারুকলা থেকেই আন্দোলনটা শুরু হয়। তখন থেকেই প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম।

১৯৬৯ সালের পরেই দেখা গেল আমাদের নিয়ে টানাহেঁচড়া করা হলো। সেখানে একটা আঘাত পাই। সে বিষয়ে এখন আর কথা বলতে চাইছি না।

২০০০ : ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে আপনারা অংশ নিলেন। তারপর এলো সরাসরি যুদ্ধের সময়কাল। সেই সময়টায় আপনি কোথায় ছিলেন?

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : এ সময় আমি চট্টগ্রামে পড়তে যাই। ১৯৭০ সালে চারুকলা থেকে গ্রাজুয়েশন করি। তখন ড. কামাল এ খান, আবুল ফজল, মমতাজ উদ্দীন আহমদ- এঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে চট্টগ্রামে আমরা আন্দোলনটা করি। ১৯৭১-এর আন্দোলনে আমরা একটা ছোট্ট বই বের করেছিলাম। সেখানে রশিদ চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, আমি, আনসার আলী, সাবিউল আলম সবাই মিলে ছবি আঁকি। আমি ২২ বা ২৪ মার্চ ঢাকায় চলে আসি...

ঢাকায় 'আর্ট এনসেম্বল' নামে একটা মাত্র গ্যালারি ছিল। তখনকার ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ড. খালেকুজ্জামান সাহেবের বাসা ঢাকার ধানমন্ডির দুই নম্বর রোডে। আমি এই গ্যালারি পরিচালনা করার চাকরি নিলাম। এটা ছিল অলাভজনক একটা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭০ সালে রশিদ চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইন আর্টসে মাস্টার্স চালু করলেন। তখন ঢাকায় মাস্টার্স ছিল না। আমি ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে সেখানে ভর্তি হয়ে যাই। ডিসেম্বর-জানুয়ারি সেশন ছিল। মাঝে মাঝে যেতাম আর এখানে কাজ করতাম। তারপর ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারিতে পুরোপুরিভাবে আমি চলে যাই। যার ফলে ঢাকার শিল্পীদের সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা কমে গেল।

ড. কামাল এ খান, আবুল ফজল, মমতাজ উদ্দীন আহমদ- এঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে চট্টগ্রামে আমরা আন্দোলনটা করি। ১৯৭১-এর আন্দোলনে আমরা একটা ছোট্ট বই বের করেছিলাম। সেখানে রশিদ চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, আমি, আনসার আলী, সাবিউল আলম সবাই মিলে ছবি আঁকি। আমি ২২ বা ২৪ মার্চ ঢাকায় চলে আসি। তখন এলিফ্যান্ট রোডেই থাকতাম। আমার বন্ধু ছিল সুজেয় শ্যাম এবং কাওসার আহমেদ চৌধুরী। গ্রিন অ্যারো নামে একটি ট্রেনে আসি। এটা সম্ভবত ২৩ মার্চের কথা। এরপর আর ট্রেন আসেনি। ২৪-২৫ তারিখে ঢাকায় আমি ভয়াবহ অবস্থা দেখি।

২০০০ : সে ভয়াবহ চিত্রটা কেমন ছিল? আর আসার পর কি বুঝতে পারছিলেন যে ভয়াবহ একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে?

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : ভয়াবহ বিষয়টি চট্টগ্রাম থেকেই বুঝতে পারছিলাম। এখানে এসে আরো ভালোভাবে বুঝলাম। দেখলাম তীর-ধনুক নিয়ে পাড়ার ছেলেমেয়েরা রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে । ব্যক্তিগত বন্দুকগুলোও তারা নিয়ে এসেছে। যে যা পেরেছে, যেকোনো ধরনের অস্ত্র, ঝাঁটা, বল্লম, জুনফি, মাছ ধরার কুচ, পাখি মারার এয়ারগান যার যা আছে। বঙ্গবন্ধুর কথায় যার যা আছে তাই নিয়ে চলে এসেছে। ২৫ তারিখ যে হামলা হবে কিছু কিছু ঘটনায় তা বোঝা গেল। বিভিন্ন রাস্তা ব্লক করে দিচ্ছিল। রাস্তায় গাছ ফেলে দিচ্ছিল। রাস্তা কেটে দিচ্ছিল সাধারণ মানুষ। মানে ঐ দিন রাতে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

২০০০ : দিনে রাস্তায় কোনো আর্মি ছিল না?

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : না, কোনো আর্মি ছিল না। আমরা বের হয়েছি, ঘুরেছি।

নীপেন নামে আমাদের এক হিন্দু বাবুর্চি ছিল। তার নাম বদলে দিলাম। একটা মুসলমান নাম দিলাম। নিচে নেমে দেখি চারজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। তিনজনের ইউনিফর্ম পরা, আর একজন লুঙ্গি পরা। তিনজনের হাতে রাইফেল। কাওসারকে বললাম, এদের তো এখানে রাখা বিপজ্জনক। ওপরে এনে ইউনিফর্ম খুলে আমাদের লুঙ্গি দিলাম। হেলমেট খুলে রাখা হলো। বুঝতে পারছিলাম পুলিশ চারজনকে এখানে রাখা ঠিক নয়...

নীপেন নামে আমাদের এক হিন্দু বাবুর্চি ছিল। তার নাম বদলে দিলাম। একটা মুসলমান নাম দিলাম। নিচে নেমে দেখি চারজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। তিনজনের ইউনিফর্ম পরা, আর একজন লুঙ্গি পরা। তিনজনের হাতে রাইফেল। কাওসারকে বললাম, এদের তো এখানে রাখা বিপজ্জনক। ওপরে এনে ইউনিফর্ম খুলে আমাদের লুঙ্গি দিলাম। হেলমেট খুলে রাখা হলো। বুঝতে পারছিলাম পুলিশ চারজনকে এখানে রাখা ঠিক নয়। থানার কাছাকাছি যেহেতু আমরা থাকি। এখানে আর্মি আসার সম্ভাবনা আছে। সকাল ৮টার দিকে পুলিশ চারজনকে অন্য দিক দিয়ে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম। দুপুরের দিকে আর্মি আর্ট কলেজে গেছি। রাত ১২টায় বোঝা গেল অবস্থার ভয়াবহতা। গোলাগুলি শুরু হলো। সারা রাত এমন চললো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থানা আক্রমণ করা হয়। সেখান থেকে কয়েকজন পুলিশ এলো রাত ২টার দিকে আমাদের এলিফেন্ট রোডের বাসায়। ঘরে আশ্রয় দিলাম। তারপর পেছন দিক দিয়ে রান্নাঘরের শিক ভেঙে তাদের বের করে দিলাম। ভোরের আজানটা সেদিন অসাধারণ মনে হলো। সেই আজানকে বড় শক্তি মনে হলো।

নীপেন নামে আমাদের এক হিন্দু বাবুর্চি ছিল। তার নাম বদলে দিলাম। একটা মুসলমান নাম দিলাম। নিচে নেমে দেখি চারজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। তিনজনের ইউনিফর্ম পরা, আর একজন লুঙ্গি পরা। তিনজনের হাতে রাইফেল। কাওসারকে বললাম, এদের তো এখানে রাখা বিপজ্জনক। ওপরে এনে ইউনিফর্ম খুলে আমাদের লুঙ্গি দিলাম। হেলমেট খুলে রাখা হলো। বুঝতে পারছিলাম পুলিশ চারজনকে এখানে রাখা ঠিক নয়। থানার কাছাকাছি যেহেতু আমরা থাকি। এখানে আর্মি আসার সম্ভাবনা আছে। সকাল ৮টার দিকে পুলিশ চারজনকে অন্য দিক দিয়ে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম। দুপুরের দিকে আর্মি এলো আমাদের বাসায়। তারা একজন পুলিশকে ধরে এনেছে। যাকে ধরা হয়েছে সে আমাদের বাসায় আসা চারজন পুলিশের একজন। সে হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে। পাকি আর্মি বাড়ির মালিককে খোঁজ করলো। নিচে বাড়ির মালিক থাকেন। আমরা দোতলায় থাকি। আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলো ওকে চেন? বললাম চিনি না। ধরাপরা পুলিশ কবুতরের মতো হাঁপাচ্ছে। আর্মিকে বললাম, এরা থানা থেকে পালিয়ে এসেছিল। আমরা জিনিসগুলো রেখে দিয়েছি, তিনটি রাইফেল, গুলি আর ইউনিফর্ম। বলল, নিয়ে আস। কাওসার উপরে গেল জিনিসপত্র আনতে। আমিও যেতে চাইলাম। আমাকে ধমক দিয়ে বলল, 'তুম মাত যাও'। বাড়ির মালিক অবসরপ্রাপ্ত দারোগা ছিলেন। তিনি বললেন, তার ছেলে পাকিস্তান আর্মিতে আছে লেফটেন্যান্ট। একজন সৈন্য তাকে চিনলেন। এর মধ্যে আমরা কিন্তু লাইনে আছি। টার্গেট করাই ছিল। কিন্তু কি কারণে জানি মারলো না। অস্ত্র আর বুলেটগুলো নিল। পুলিশের হুইসেলের ফিতা দিয়ে লোকটাকে বাঁধলো। বললো পা উপর দিকে গাছের সঙ্গে বেঁধে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। কাওসারের দাড়ি ছিল বলে কি না জানি না, আমাদের ছেড়ে দিল। অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলাম। তারপর বাসা ছেড়ে দিলাম। ২৬ মার্চের ঘটনা। ২৭ মার্চ কার্ফ্যু শিথিল ছিল। শাহাবুদ্দিন ও কামরুল হাসানের বাসায় গেলাম। শাহাবুদ্দিনকে পেলেও কামরুল হাসানকে পেলাম না। চারুকলার সামনে দেখি ভয়াবহ অবস্থা। আমি হেঁটে যাচ্ছি। শহীদ মিনারে যাব। জগন্নাথ হল আর রোকেয়া হলের পেছনে দেখি একটি হাত বেরিয়ে আছে। গণকবর দিয়েছে। সকালের দিকে মনে হয় একটু বৃষ্টি হয়েছিল। শুধু হাতটা বেরিয়ে আছে। শহীদ মিনারটা ভাঙা। সম্পূর্ণ শহীদ মিনারটা পেছনে পড়ে আছে।

তারপর ছাত্রদের অবস্থা জানার জন্য আর্ট কলেজের হোস্টেলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যাওয়া সম্ভব হলো না। আনোয়ার স্যারের বাসা ছিল আজিমপুর কলোনিতে। আনোয়ার স্যারের বাসায় গেলাম। সেখানে দেখি ভয়ঙ্কর অবস্থা। কাইয়ুম চৌধুরী, কিবরিয়া স্যার, আনোয়ার স্যার, বাসেত স্যার, সবাই আছেন। তারা সবাই চারুকলার শিক্ষক। আমাকে তারা বললেন, চারুকলার হোস্টেলে আমাদের সবার সাইন করা পোস্টার আছে। সেগুলো ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আমার কাছে মনে হলো এটা গুরুজনদের আদেশ। যে করেই হোক পালন করতে হবে। আমি আজিমপুর থেকে নিউমার্কেটের প্রধান গেটে গেলাম। বের হয়ে গেটের মুখেই দেখলাম ২-৩ জন দারোয়ান, যারা রক্ষী ছিল- মরে পড়ে আছে। ভেতরে গিয়ে আরো ৩/৪টি লাশ

দেখলাম। তারপর চারুকলার হোস্টেলে গেলাম। গেট বন্ধ। গেট টপকালাম। তখন বস্তির ২-৩ জন লোক চলে আসলো। এরা সব সময় আমাদের সঙ্গে গণআন্দোলনে বের হয়। তাদের কাছে শুনলাম শাহনেওয়াজকে মেরে ফেলেছে। তার লাশ তখনও সেখানে। চোখ-দুটো বের হয়ে আছে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে। প্রত্যেকটা ঘর আমি খুলেছি। ছয় নম্বর ঘরে সেই পোস্টারগুলো পেলাম। এতো মূল্যবান সেই পোস্টার।

দুটো সম্পদ আমার হাত দিয়ে ধ্বংস হয়েছে। একটা হলো '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পোস্টার আর ঐ পোস্টারগুলো। নিজেই কেরোসিন দিয়ে আগুন জ্বালালাম। জয়নুল আবেদীনের আঁকা ছবি, কিবরিয়া স্যার কখনো আঁকেন না। কিন্তু তিনি সেই পোস্টার এঁকেছিলেন। সেগুলো আমার হাত দিয়ে নষ্ট করতে হয়েছে, এটা আমার জন্য ভীষণ কষ্টকর অভিজ্ঞতা।

২০০০ : এখন মনে হয় না যে না পুড়িয়ে অন্যভাবে সংরক্ষণ করা যেতো।

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : আমাদের তো কোনো আস্তানা ছিল না। ছাত্র তো-আর তখন তো এগুলো কেউ রাখতে রাজিও হবে না। তারপর আগস্ট মাসের দিকে ক্রাক প্লাটুনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম তাদের সঙ্গে।

২০০০ : এদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেন কেমন করে?

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : শাহাদত চৌধুরী, আবুল বারক আলভী ওরা আমাদের খোঁজ করে বের করলো।

২০০০ : মাঝের সময়টা কোথায় ছিলেন?

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : আমার সরাসরি যুদ্ধ করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু প্রশিক্ষণ নেয়ার সুযোগটা আমি পাই নাই। নিজ হাতে পাক আর্মি মারবো এমন একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল মনে। মনে হয়েছিল এ সুযোগ আমার আসবে। কাওসার এপ্রিলে চলে গেল ভারতে। আমার একটা বেদনা যে নিজ হাতে অস্ত্র নিয়ে পাক আর্মি মারতে পারিনি। আমি তখন ধানমন্ডি দুই নম্বর রোডের আর্ট এনসেম্বল গ্যালারিতে কাজ করছি। সেখানে ক্রাক প্লাটুনের গেরিলাদের আসা-যাওয়া ছিল। ভাসানী ন্যাপের কোষাধ্যক্ষ সাইদুল হাসান সাহেবের স্ত্রী ফরিদা হাসান ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি। ফরিদা ভাবি একদিন বললেন যে ভাইকে তিনি পাচ্ছেন না। আমি যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও, একটা বেদনাবোধ সব সময় কাজ করতো যে নিজের হাতে অস্ত্র নিয়ে সক্রিয়ভাবে আমি যুদ্ধ করতে পারিনি। স্বাধীনতার পর এমন কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করলাম। যার মধ্য দিয়ে সমগ্র মুক্তিযুদ্ধটাকে বোঝা যাবে। শুরু করলাম 'অপরাজেয় বাংলা'র কাজ।

২০০০ : কিভাবে শুরু হল। কেউ বললো, নাকি নিজের থেকেই এ ধরনের কাজ শুরু করলেন?

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : নিজের তাগিদেই শুরু করি। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে অপরাজেয় বাংলার কাজটা শুরু করি। স্কেচ ক্লাব নামে একটি ক্লাব করা হয়েছিল। কাইয়ুম চৌধুরী, আলভী, মাহবুব, বিরেন, সমরজিৎ স্যার সবাই ছিলেন এই ক্লাবে। ওখানে শিল্পীদের একটা আড্ডা ছিল। আমি দেখলাম সেখানকার হল রুমটা ব্যবহার করা যায়। ওখানেই ফাঁকে ফাঁকে গিয়ে আমি কাজ করতাম। এখন যেখানে অপরাজেয় বাংলা যেখানে আগে লতিফ সাহেবের করা আরেকটি ভাস্কর্য ছিল। ওটা যে কোনো কারণে ভাঙার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেখানে আরেকটি ভাস্কর্য বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যখন ঠিক করলো

যে এখানে আর একটা ভাস্কর্য বসানো হবে, ডাকসুর আপ্যায়ন সম্পাদক ম. হামিদ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

২০০০ : পুরো কনসেপ্টটা কি আপনারই ছিল?

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : হ্যাঁ সম্পূর্ণ কনসেপ্টটাই আমার। ম. হামিদ চারুকলায় ঘুরে ঘুরে দেখেছে কে ভালো ভাস্কর্য তৈরি করছে। এটা ডুয়েল কো ইনসিডেন্স হয়ে গেছে। ওনারা একটা কাজ খুঁজছে। এদিকে আমিও কাজটা শুরু করেছি। সিরামিক সেকশনে 'লেট মি সাউট' নামে আমার একটা মোরগের ভাস্কর্য ছিল। এটা আইয়ুব খানের প্রেস অর্ডিনেন্সের বিরুদ্ধে আমার একটা প্রতীকী প্রতিবাদ। আরো কিছু কাজ সেখানে ছিল। আমার অপরাজেয় বাংলার জন্য তখন মাটি এনে কাজ শুরু করেছি। কৃষক শ্রেণী গ্রামের প্রতিনিধি। গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা, শহরের মুক্তিযোদ্ধার বিভাজন দেখিয়েছি। মহিলাদের অংশগ্রহণ দেখিয়েছি। অনেকে বলেন, মহিলার হাতে কেন রাইফেল দিলাম না। রাইফেল তো আমি নিজেও ধরিনি। রাইফেল ধরলেই যে একজন যোদ্ধা হয় তা নয়। সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণটা আমাকে একটা নাড়া দিয়েছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনমানুষের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক। সাধারণ মানুষ অসীম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। এই সাধারণ যোদ্ধাদের সঠিক মূল্যায়ন যুদ্ধের পরে হয়নি বলেই আমার মনে হয়। আর্মি থেকেই হলো সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ। হাবিবুল আলম, আহমেদুল আমিন, আবুল বারক আলভী, শাহাদত চৌধুরী... এরা সবাই খুব বড় মাপের মুক্তিযোদ্ধা। এদের কেউ কেউ বীর প্রতীক উপাধি পেয়েছেন। যুদ্ধে নিহতও হয়েছেন অনেকে। কিন্তু জনযোদ্ধাদের কাউকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি দেয়া হয়নি। এ কারণে সাধারণ যোদ্ধাদের প্রতিনিধিত্ব করে এ রকম কিছু একটা করতে চেয়েছিলাম।

২০০০ : সেই তাগিদ থেকেই তো অপরাজেয় বাংলার সৃষ্টি।

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : ১৯৭৩-এ আমি মডেলটা শেষ করি। এই কাজটি করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বাজেট ছিল না। সেই সময়ের ভিসি আবদুল মতিন চৌধুরী ৫০ হাজার টাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। অর্থ

১৯৭৩ সালের শেষের দিকে অপরাজেয় বাংলার কাজটা শুরু করি। স্কেচ ক্লাব নামে একটি ক্লাব করা হয়েছিল। কাইয়ুম চৌধুরী, আলভী, মাহবুব, বিরেন, সমরজিৎ স্যার সবাই ছিলেন এই ক্লাবে। ওখানে শিল্পীদের একটা আড্ডা ছিল। আমি দেখলাম সেখানকার হল রুমটা ব্যবহার করা যায়। ওখানেই ফাঁকে ফাঁকে গিয়ে আমি কাজ করতাম

পর্যাপ্ত না হলেও কাজ শুরু করলাম পুরোদমে। তারপর এক পর্যায়ে কাজ আবার বন্ধ হয়ে গেল। এটা যদিও অর্থের জন্য নয়।

২০০০ : তাহলে কাজ বন্ধ হলো কেন?

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন। আমার কাজ করা বন্ধ হয়ে গেল। উপাচার্য মতিন সাহেব গ্রেপ্তার হলেন। সে অনেক ঘটনা। ১৯৭৭ সালে মৌলবাদীরা অপরাজেয় বাংলা ভেঙে ফেলার জন্য আন্দোলন শুরু করে। সিগনেচার ক্যাম্পেইন শুরু। এটা নিয়ে সংঘর্ষ হয়। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে কাজটা আবার শুরু হলো। জিয়াউর রহমানের সময়। আমার সঙ্গে কর্তৃপক্ষই যোগাযোগ করলো আবার। এর মধ্যে

বিভিন্নভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগেও চেষ্টা করেছিলাম কাজটা করার। কিন্তু করে উঠতে পারিনি। অসম্পূর্ণ কাজটি দেখতেও খারাপ লাগছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কেউ কেউ এটা ঠিকভাবে করতে বলেছিলেন অথবা ভেঙে ফেলতে বলছিলেন। মৌলবাদীরা চাচ্ছে এটা ভেঙে ফেলা হোক। বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে দেশের সাধারণ জনগণের দাবি এটাকে কমপ্লিট করা হোক। এ রকম একটি সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে কাজ শুরু করতে বললেন।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৮-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত আমার কোনো স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ছিল না। না পারছি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটা করতে, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি যায় না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছেও যাচ্ছি। ম. হামিদও প্রচুর খেটেছেন তখন। ১৯৭৭ সালে ইংল্যান্ড গেলাম আবার চলেও এলাম। আর্কিটেক্ট মাজহারুল ইসলামের একটা ক্যানভাস ছিল। আমি ক্যানভাস চাইলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কেন? আমি বললাম ছবি আঁকবো। কারণ আমার তো কিছু করার নেই। তিনি রোলটা আমাকে দিয়ে দিলেন শুধু ২ ইঞ্চি স্কয়ারের একটা পিস রেখে দিলেন। বউকে শ্বশুরবাড়ি রেখে পাগলের মতো ঘুরছি। তারপর যখন কাজটা শুরু হলো, মনে হলো জীবনটা ফিরে পেলাম। আমি তখন চট্টগ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা আমার বাসা খুঁজে বের করে বললেন কাজটা আবার করতে। আমাকে একটা প্লেনের রিটার্ন টিকেট দিলেন। ২-৩ দিনের মধ্যে ছুটি নিয়ে ঢাকায় এলাম। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফজলুল হালিম চৌধুরী। তিনি বললেন যে অপরাজেয় বাংলা হয় ভাঙতে হবে, নয় কমপ্লিট করতে হবে। আমি কমপ্লিট করার পক্ষে। কবে থেকে আমি কাজ শুরু করবো জানতে চাইলেন। আমি বললাম এখন তো ডিসেম্বর মাস, আমাকে একটু সময় দেয়ার জন্য। বছরের প্রথম থেকে কাজটা করতে চাই। আমাকে একটা চিঠি দেবেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। মতিন চৌধুরী যেভাবে দিয়েছিলেন। আমি যেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেতনটা পাই।

সেই বেতন আর ঢাকায় থাকার জন্য একটা বাসা আর পনেরো'শ টাকা আমাকে দেয়া হতো মাসে। জিগাতলায় থাকতাম।

২০০০ : আবার কাজ শুরু করলেন '৭৯ সালে। শেষ হলো কবে?

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : অপরাজেয় বাংলা শেষ হলো '৭৯ সালের ডিসেম্বর

১৯৭৭ সালে মৌলবাদীরা অপরাজেয় বাংলা ভেঙে ফেলার জন্য আন্দোলন শুরু করে। সিগনেচার ক্যাম্পেইন শুরু। এটা নিয়ে সংঘর্ষ হয়। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে কাজটা আবার শুরু হলো। জিয়াউর রহমানের সময়। আমার সঙ্গে কর্তৃপক্ষই যোগাযোগ করলো আবার। এর মধ্যে বিভিন্নভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগেও চেষ্টা করেছিলাম কাজটা করার। কিন্তু করে উঠতে পারিনি। অসম্পূর্ণ কাজটি দেখতেও খারাপ লাগছিল...

মাসে। আমাকে প্রশ্ন করা হলো কাকে দিয়ে উদ্বোধন করানো যায়। আমি বললাম, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে ওপেন করা হোক। তখন ডাকসুতে মান্না-আখতার ছিলেন। সামনে পর্দা দিয়ে ঢেকে দিলেন। হুইল চেয়ারে ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা ডান দিকে, ছয়জন বাঁদিক থেকে পর্দা টেনে ওপেন করলেন। তার আগে একটা অনুষ্ঠানও হয়েছিল টেলিভিশনে। শাহাদত চৌধুরী সেই অনুষ্ঠানটা উপস্থাপনা করেছিলেন। এই উদ্বোধন করা নিয়ে একটা রাজনীতি হয়েছিল। যা ছিল খুবই দুঃখজনক। ম. হামিদরা ১৪ ডিসেম্বর আমাকে বাদ দিয়েই অপরাজেয় বাংলা উদ্বোধন করলেন। অপরাজেয় বাংলা তারা করেছেন বলে দাবি করলেন। অপরাজেয় বাংলা করার সময় আমার সহকারী ছিল বদরুল আলম বেণু। ম. হামিদদের অবদানও আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমি তো মূল ব্যক্তি। অপরাজেয় বাংলার পুরো কনসেপ্টই আমার। অথচ আমাকেই বাদ দেয়ার চেষ্টা করা হলো। আমার কাজের সঙ্গে অনেকে যুক্ত হয়েছেন। তার মানে তো এই নয় যে, তারাই মূল ব্যক্তি।

তারপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৬ ডিসেম্বর উদ্বোধন করেছে। সেখানে আমাকে যথাযোগ্য সম্মান দেয়া হয়েছে।

২০০০ : মডেল নিয়ে বোধহয় একটু বিতর্ক আছে?

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : মডেল তিনজন হচ্ছেন বদরুল আলম বেনু, হামিদ মকসুদ এবং হাসিনা আখতার। এখন নাকি কেউ কেউ বলেন, ফাল্গুনী হামিদ মডেল ছিলেন। আসলে বিষয়টি ঠিক নয়। আমার অপরাজেয় বাংলার মূল মডেলের কাজ শেষ হয়েছে ১৯৭৩ সালে। তখন সম্ভবত ফাল্গুনী হামিদ ঢাকাতেই ছিলেন না। তিনি কী করে মডেল হবেন? তারপর তিনি টিভিতে বলেছেন, তিন মাস দাঁড়িয়ে থেকে মডেল হয়েছেন। এটা একেবারেই কাল্পনিক গল্প। মডেল বেণু এই ভাস্কর্য নির্মাণে আমার সহকারী হিসেবে অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন।

২০০০ : পাগলের মতো কাজ করে তো অপরাজেয় বাংলার কাজটা শেষ করলেন। উদ্বোধনের পর সাধারণ মানুষের কাছ

থেকে যে প্রশংসা পেলেন তার অনুভূতি কেমন?

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : এক কথায় বলা যায় সবাই এটাকে প্রশংসা করেছে। পছন্দ করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতীকে পরিণত হয়েছে অপরাজেয় বাংলা। একজন শিল্পীর এর চেয়ে বড় সার্থকতা আর কি থাকতে পারে?

২০০০ : বর্তমান বাংলাদেশকে কীভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন?

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : আমি হয়তো কিছুটা হতাশায় ভুগছি। বর্তমান অবস্থায় আমরা তো সঠিক নির্দেশনা পাচ্ছি না। উপযুক্ত নেতৃত্ব পাচ্ছি না। এখানে আমাদের একটা বিরাট শূন্যতা।

২০০০ : সাম্প্রতিক যে আলোচনা মৌলবাদীদের বা স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের উত্থান, এই বিষয়গুলো কি আপনার মধ্যে কাজ করছে?

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : সেগুলো কাজ করেছে। এগুলো দেখারও একটা অনুভূতির ব্যাপার আছে। আমার কাছে তো এটা বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনে হচ্ছে। মাজারে বোমা মারছে। মাছগুলো কিংবা কচ্ছকগুলো কী করলো! এটা তো কোনো সুস্থ, সুন্দর ধর্মীয় চেতনাবোধ নয়। এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাপার। এগুলো তো করানো হচ্ছে।

২০০০ : কারা করাচ্ছে মনে করেন?

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : যেখানে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড একটা পেশা হয়ে গেছে, ধর্মের নামে যদি কেউ করে থাকে তারাও অন্ধ বিশ্বাসে ভুগছে। এটা খুব দুঃখজনক।

২০০০ : সবকিছু মিলেমিশে মানসিকভাবে খুব একটা সুস্থ নেই।

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : না খুব সুস্থ জায়গাতে নেই। যারা করছে তারা কতোটুকু বুঝে করছে। কতোটুকু ধর্মীয় চেতনাবোধ থেকে করছে?

২০০০ : এগুলো আপনার জীবনে প্রভাব ফেলছে কিভাবে? এখন তো আপনি ছবি আঁকছেন। ছাত্র পড়াচ্ছেন, এতে কি ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে?

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : পড়াতে গিয়ে ব্যাঘাত ঘটছে না। তবে আমাদের নাগরিক চেতনাবোধটা আরো প্রখর হওয়া উচিত। নেতাদের এটাই দায়িত্ব ছিল। আমি এখন ইসলামিক অনুষ্ঠানগুলো দেখি। ভালোলাগা বা না লাগার কোনো বিষয় নেই। প্রতিটি চ্যানেলেই এ অনুষ্ঠান চলছে। আজ আমি আসার সময় পড়লাম যে যারা টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করে তারাও কাফের। এখন কাফের বলে আমাকে মেরে ফেলার কোনো অধিকার কিন্তু কোনো ধর্মই কাউকে দেয়নি।

তার আগে একটা অনুষ্ঠানও হয়েছিল টেলিভিশনে। শাহাদত চৌধুরী সেই অনুষ্ঠানটা উপস্থাপনা করেছিলেন। এই উদ্বোধন করা নিয়ে একটা রাজনীতি হয়েছিল। যা ছিল খুবই দুঃখজনক। ম. হামিদরা ১৪ ডিসেম্বর আমাকে বাদ দিয়েই অপরাজেয় বাংলা উদ্বোধন করলেন। অপরাজেয় বাংলা তারা করেছেন বলে দাবি করলেন। অপরাজেয় বাংলা করার সময় আমার সহকারী ছিল বদরুল আলম বেণু। ম. হামিদদের অবদানও আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমি তো মূল ব্যক্তি। অপরাজেয় বাংলার পুরো কনসেপ্টই আমার

২০০০ : এখন আপনি কী নিয়ে কাজ করছেন?

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : আমি মূলত এখন প্রকৃতি নিয়ে কাজ করছি। ঢাকা-চট্টগ্রাম দু'বিশ্ববিদ্যালয়েই। সেখানে প্রচুর গাছপালা লাগানো হয়েছে। আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন আবদুল আজিজ খান। তিনি প্রচুর গাছপালা লাগিয়েছিলেন। আমি যেহেতু ওখানে পড়াই, তাই প্রকৃতি নিয়েই কাজ করি। প্রকৃতির কাছেই তো ফিরে যাবো শেষ পর্যন্ত। পুরোপুরি হতাশাগ্রস্ত নই আসলে। আমাদের বৃহত্তর ঐতিহ্যবোধ নিয়ে পড়াশোনা করি। বৃহত্তর ভারতেরই অংশ আমি । বিভিন্ন সময় স্বাধীনতার জন্য খন্ড খন্ড হয়েছে। ভারতীয় চিন্তা-চেতনার উৎস খোঁজার চেষ্টার করছি। জানার চেষ্টা করছি। আমি একজন বাঙালি। আমার পূর্বপুরুষ এক হাজার বা সাত'শ বছর আগে মুসলমান হয়েছিল। সেখানে আমার কী অপরাধ? আমি তো ওখানেরই বাসিন্দা। এই চেতনাবোধগুলোকে ধারণ করার চেষ্টা করছি। এগুলোকে বোঝার ব্যাপার আছে।

২০০০ : আপনি সর্বশেষ প্রদর্শনী করেছিলেন ১৯৯৮ সালে। তুলনামূলকভাবে কাজ কম করেন, নাকি প্রদর্শনী কম করেন?

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : প্রদর্শনীই কম করি। ভালো ছবি রাখা যায় না। আমি মনে করি আগে আমি নিজে তৃপ্ত হব, তারপর প্রদর্শনী। তৃপ্ত হওয়ার যে কাজগুলো থাকে তা তো বিক্রি করে খেতে হয়। সবাই দেখে প্রদর্শনী হলো। সুতরাং নিজে তৃপ্ত হচ্ছি না বলেই হচ্ছে না। ফিগার নিয়ে কাজ করবো, ফিগার পাচ্ছি না। থাকি চট্টগ্রাম। বন্ধে ঢাকায় আসি। ছবির মার্কেট আবার ঢাকায়। সব দিকেই সমস্যা। আমাদের দেশের শিল্পীদের ঠিক ফুলটাইম শিল্পী বলা যায় না। কারণ ফুলটাইম কেউ শিল্পী না। চাকরি যারা করেন বেতনে হয় না। ফলে অন্য কিছু করতে হয়। সেই ডেডিকেশনটা ঠিক পাওয়া যায় না। পড়াশোনা করি যখন তখন মনে হয় এতো সুন্দর সুন্দর ঘটনা হয়ে গেছে যে, নতুন করে আর করার কিছু নেই। মেলামেশা করার মানুষের সংখ্যাও কমে গেছে। তাই পড়ালেখা করি। পড়ার মধ্যে আনন্দ, অন্য জগৎকে পাওয়া যায়।

২০০০ : এ মুহূর্তে কী পড়ছেন?

সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ : কালিদাসের রচনাবলী, বেদ পড়ছি। পৌরাণিক অভিধান। আবার কালনিরবধি পড়লাম ড. আনিসুজ্জামানের। প্রথম আলো পড়লাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের। প্রথম আলো পড়ে আমি পরিতৃপ্ত হইনি। ঘটনার বিবরণ করে যাচ্ছেন। আমার মনে হয় বঙ্গভঙ্গ না হলে ভারত ভাগ হতো না। এটা উনি এনেছেন। কিন্তু ভগ্নি নিবেদিতা, রামকৃষ্ণ পরমহংস, রাজা রামমোহন রায়, সি আর দত্ত, ঋষি অরবিন্দ, বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ এঁদের ফিলোসফিটা কিন্তু আসেনি। প্রায় দু'শ বইয়ের রেফারেন্স আছে। কিন্তু ভেতরে নির্যাসটা আসেনি। আমি রেড ইন্ডিয়ানদের একটা বই পড়লাম, তাতে যে দুটো কবিতার লাইন অসম্ভব সুন্দর-

'হেথায় রব না চিরদিন, আবার আসিব ফিরে,
আবার যাবো অনন্তে মিশে-
তবুও আমাকে কবর দিও হাঁটু ভাঙার বাঁকে।'

এ অনুভূতিটা অসম্ভব সুন্দর। একটা মানুষ একটা বিশেষ জায়গায় জন্মায়। আবার বিশেষ অনুভূতি নিয়ে সে চলে যায়, আবার এর জন্যই তার কান্না। এ বিশেষ জায়গাটাই মনে হয় জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি। আদি এবং অনন্ত।

গ্রন্থনা : **শিল্পী মহলানবীশ**